হুমায়ুন আজাদ

সাগর বিশ্বাস

(১৯৪৭ - ২০০৪)

জন্মেছিলেন ঢাকা বিক্রমপুরের রাড়িখাল গ্রামে ১৯৪৭ সালের ৪ এপ্রিল, অর্থাৎ দেশভাগের চার মাস দশদিন আগে। সেদিক থেকে হুমায়ুন আজাদ আমারই মতো অবিভক্ত ভারতের সন্তান। কিশোর বয়স থেকে দেখে এসেছেন পূর্ব-বাঙালার প্রতি মোচনের সংগ্রাম। স্বাভাবিক নিয়মেই পাকপন্থী ইসলামি মৌলবাদীরা তাঁকে নেকনজরে দেখতে পারেন না। অধিকন্তু, তাঁর হাতে কলম ছিল, ভাষায় ছিল প্রতিবাদ, হৃদয়ে ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা। সুতরাং বুদ্ধিজীবী হত্যায় সিদ্ধহস্ত আয়াতোল্লাবাদীদের খতম তালিকায় তাঁর নামউঠে আসবে এর আর বিচিত্র কী! ২৭ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় বাঙালা একাডেমির কাছে যখন ঘাতকের নির্মম ছুরিকাঘাতেগুতর আহত হলেন, তখনই পরিস্কার বোঝা গেল দেশের মাটিতে হুমায়ুনের জীবন বিপন্ন। ক্ষোভে, প্রতিবাদে ফেটে পড়ল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা। ড. হুমায়ুন আজাদ তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের অধ্যাপক।অন্তত ষাটখানা গ্রন্থের রচয়িতা। প্রথমে ঢাকার সামরিক হাসপাতল, পরে ব্যাঙ্ককে মাসের পর মাস একটানা প্রাণপণ চিকিৎসায় আস্তে আস্তে সেরে উঠলেন। ডাক এল জার্মানি থেকে। এক বছরের জন্য মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলোশিপ। হুমায়ুন মিউনিখে পৌঁছলেন ৯ আগস্ট। রাতে টেলিফোনে কথা বললেন লতিফা (স্ত্রী), অনন্য (ছেলে,) এবং দুইকন্যা মউলি আর স্মিতার সাথে। এর মাত্র দু'দিন পরে তাঁকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল ঘরের মধ্যে। এ খবর ঢাকায় পৌঁছতেই বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় শুরু হল ছাত্রবিক্ষোভ। পরিবারের অভিযোগ ঃ এই মৃত্যু স্বাভাবিক নয়।দেশের মাটিতে মারতে না পেরে মৌলবাদী ষড়যন্ত্রীরা আজাদকে খুন করেছে জার্মানিতে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকসংগঠনের সভাপতি আরেফিন সিদ্দিকিও ক্ষোভের সঙ্গে বললেন ঃ বিদেশ যাওয়ার আগে তাঁর জীবন - নাশের হুমকি দেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু কেন এই হুমকি? কেন জীবননাশ? এ পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষেরই বাঁচার অধিকার আছে। মানুষের সেই মৌলিক অধিকার যারা ঘুচিয়ে দিতে চায় তারা আর যা-ই হোক সভ্যতার ছাড়পত্র পেতে পারে না। অথচ দেশেদেশে আজকের পৃথিবীতে ধর্মের নামে, গোষ্ঠীর নামে, জাতির নামে, এই বর্বরতা চলছে যাকে এককথায় ফ্যাসিজম ছাড়া আর কিছু বলা যায়না। হুমায়ুন আজাদ মনেপ্রাণে এ - জাতীয় বর্বরতার বিদ্ধে লড়াই করেছেন। একাত্তরে যারা পাকিস্তানি খান সেনাদের সাথে হাত মিলিয়েছিল, আজও যারা বাঙলাদেশকে পাকিস্তান বানাতে চায় তাদের তিনি কোনোদিনই ক্ষমা করতে পারেননি। তাঁর 'পাক সার জমিন সাদ বাদ' (প্রকাশক ওসমান গনি, আগামী প্রকাশনী) গ্রন্থের শুটাই হয়েছে এই ভাষায় ঃ

''আমরা ইছলামি জিহাতে বিশ্বাস করি। সবহ মুছলমানের জন্যে এটা ফরজ।

আমরা বিশ্বাস করি যতোদিন না পৃথিবীরে সমস্ত কাফের ইছলামে ঈমান আনবে, ততোদিন আমাদের জিহাদ চালিয়ে যেতে হবে; জিহাত পরম রাহমানির রাহিম আল্লার নির্দেশ, তা আমরা হরফে পালন করবো; নিজেদের বুকের খুন দিয়ে, কাফেরদের বুকের খুন নিয়ে। আমরা কোনো ভাণ্ডামোতে বিশ্বাস করি না; ভণ্ডামো হচ্ছে নাছারাদের, মালাউনদের ধর্ম ও কর্ম; তবে অনেক ভ ণ্ড আছে, যারা মুছলমানের ছদ্মবেশ প'রে আছে, তারা মহান আল্লারবাণীর ব্যাখ্যা দেয় শয়তানের মতো, ---তারা শয়তান, তারা শয়তানের ছহবতে উৎপন্ন; তারা বলে, ইছলামে আর গণতন্ত্রে কোনো বিরোধ নাই। যারা একথা বলে, তারা কাফের, তারা মুরতাদ। ইছলাম হচ্ছে আল্লার, গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র নামের খানকিবৃত্তি হচ্ছে কাফেরদের, নাছারাদের, ইহুদিদের, খ্রিস্টানদের; কাফেরদের ধবংস করা ধবংস করা হচ্ছে রাহমানির রাহিম আল্লাতালায় অকাট্য নির্দেশ। ধবংস করতে হবে নিরন্তর, নিদ্রাহীন, বিরামহীন জিহাদের মাধ্যমে। আল্লা - রছুলের বাণী ঠিক বুঝেছিলেন হজরত আবু আলা মওদুদি ও আয়াতুল্লা হুল্লা খোমেনি, বেহেশতে তাঁরা শ্রেষ্ঠস্থান পাবেন। এক সময় আমি সাম্যবাদ ও সর্বহারা করেছি---নাউজবিল্লা, ---মার্ক্স - এঙ্গেলস - লেনিন - টটস্কি - স্ট্যালিন-মাওসেতুং নামের কতকগুলো ইবলিশ, শয়তান, ডেভিলের, মেফিস্তোর, বই পড়েছি; মনে করেছি শ্রেণীসংগ্রামই আসল কথা, সর্বহারা পাক ইছলামের পবিত্র কিতাবগুলো প'ড়ে বুঝতে পারি আমি কাফের হয়ে গিয়েছিলাম, মুরতাব হয়ে গিয়েছিলাম, চরম ভুল পথে চ'লে গিয়েছিলাম। এই বইগুলো পড়া সহজ, বোঝাও সহজ; কোনো কচকচি নেই, আছে চরম সত্য, আছে চরম নির্দেশ; আমি তওবা ক'রে ইছলামে ফিরে আসি, যেমন ফিরে এসেছেন আমার অনেক নেতা, প্রায় সব নেতা, যারা সাম্যবাদের জন্যে নিজেদের কোরবানি করেছিলেন, এখন তাঁরা অন্য রকমে বলি হয়ে গেছেন। ওই কুফরি থেকে আমাকে উদ্ধার করে 'জামাঈ জিহাদে ইছলাম পার্টি'। হজরথ আবু আলা মওদুদি ও আয়াতুল্লা হুল্লা খোমেনির কিতাব প'ড়ে আমি বুঝতে পারি খাঁটি ইছলামকে; আমার দিল বদলে যায়, আমি পাক হয়ে উঠি, জিহাদি হয়ে উঠি।''

ধর্মীয় মৌলবাদকে নির্মমভাবে এখানে তুলে ধরা হয়েছে। উত্তর পুষে বর্ণিত এ উপন্যাসের নায়ক 'জামাঈ জিহাদে ইছলাম পার্টি' নামে এক মৌলবাদী সংস্থার নেতৃস্থানীয় সক্রিয় কর্মী। লেখক নিজেইচরিত্রে অবতীর্ণ। তিনি একদল তথাকথিত 'জিহাদি' মুছলমানের গ্রুপ লিডার---যারা পৃথিবীকে কাফেরমুক্ত করার দিবাস্বপ্নে মশগুল। এইসব গোঁড়া, অন্ধমুছলমান জিহাদিদের চোখে কেবল বিধর্মীরাই যে ঘৃণ্য তা নয়, তাদের মতে যারা 'মুছলমানের ছদ্মবেশ' পরে আছে সেইসব গণতন্ত্রী স্বধর্মীরাও সমান ঘৃণ্য। কিন্তু এইসব কাফের এবং মুরতাদদের ঘরের সোমত্ত মেয়েরা বউরা কিন্তু ঘৃণ্য নয়--- তারা কামনার ধন। হুমায়ুন লিখছেন, ''আমি বলি, 'আমার জিহাদিরা এসছে একটু বিজয় উৎসব করার জন্যে, বিজয়ের পর উৎসব করার নিয়ম আছে, আপনারা জানেন, তাদের একটু উৎসব করতে দিন।'

তারা বলে, 'হ, জয়ের পর ত উৎস করতেই হয়। তাইলে আমরা বাইদ্যকরগো লইয়া আহি।'

আমি বলি, 'বাদ্যকার লাগবে না, জিহাদিরা একটু উৎসব করবে, একটু দোলা যাত্রা আর ঝুলন পূর্ণিমা করবে, বাধাটাধা দিয়েন না, তাহলে পাঁচ দশটা লাশ পড়বে,

আর আপনাদের মেয়েদের জিহাদিরা ধর্ষণ করেছে, এটা জানাজানি হ'লে আপনারা মুখ দেখাতে পারবেন না।'
তারা বলে, 'হুজুর, আমাগো মাফ করেন, আমাগো ট্যাকাপয়সা যা আছে লইয়া যান, খালি আমাগো মাইয়াগুলিরে মাফ করেন।'
আমি বলি, 'জিহাদিরা ধর্ষণ করবে না, জেনা করা হারাম, তারা বিছমিল্লা ব'লে একটু ছহবত করবে, তাতে গুনাহ্ হবে না।'' (পাক সরা জমিন সাদ বাদ, পৃষ্ঠা ২৮)।
কেবল সোমত্ত মেয়ে বউরাই নয়, কিশোরী বালিকারাও নিস্তার পায় না।
''মেয়েটির বাবা আর মা আমার পায়ে এসে পড়ে; বলে, 'হুজুর, দশজন
জিহাদি মাইয়াডার উপুর একলগে ঝাপাই পরছে।'
আমি বলি 'কিভাবে ওরা করলে আপনারা খুশি হন?'
মেয়েটির মা বলে, 'হুজুর, আমার মাইয়াডার মাত্র দশ বচ্ছর, আর অহনও রক্ত দেহা দেয় নাই, ও নাবালিকা, হুজুর।'
আমি বলি, 'রক্তের দরকার নেই, রক্ত আমরা অনেক দেখেছি।'
মেয়েটির মা পায়ে প'ড়ে বলে, 'মাইয়াডা মইর‍্যা যাইব, হজুর।'
আমি বলি, ' তাহলে জিহাদিরা কীভাবে উৎসব করবে?'
''আমি তাজ্জব হই জিহাদিদের পিস্তলের শক্তি দেখে। তারা একের পর এক পিস্তল চালাতে থাকে। বাপমায়ের সামনেই, কেউ কেউ মেয়ের পর মাকে, মায়ের পর মেয়েকে পরখ করে; আমরা কোনো তাণ্ডব করি না, আমার জিহাদিরা পাড়ায় পাড়ায় ঠাণ্ডা আগুনের মতো জ্বলতে থাকে; ঠাণ্ডা আগুনের মতো আর কোনো আগুন নেই, ওই আগুন ছাই করে, কিন্তু পোড়ে না, তার শিখা দেখা যায় না। পাড়ায় কোনো তাণ্ডবের শব্দ ওঠে না, বরং একটু বেশি নিঃশব্দ হয়।'' (ঐ)
নারীলোলুপ নৃশংসতার এই বিভৎসা অনিবার্যভাবেই আমাদের মনে করিয়ে দেয় নাজি অত্যাচারের কথা, ছেচল্লিশের দাঙ্গার কথা, গুজরাটে বজরঙ্গী পিশাচ - নৃত্যের কথা। পাকিস্তানের জাতীয় সঙ্গীতের প্রথম পংক্তি দিয়েশীর্ষ নামাঙ্কিত এই বই পাঠককে নিয়ে যায় এমন এক অন্ধকার জগতে, যেখানে তথাকথিত ধর্মের মে াড়কে মতলবী মানুষের দল হাসতে হাসতে নিরীহ মানুষের যাবতীয় মৌলিক অধিকারকে নিশ্চিহ্ন করতে পারে। হুমায়ুন তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে অত্যন্ত গভীর তির্যকতায় দেখিয়েছেন কীভাবে পাক-দর্শন ও অন্ধ সাম্প্রদায়িকতা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের যাবতীয় সত্যকে গুঁড়িয়ে দিতে চেয়েছে। গভীর অনুরাগে তাই এ বইয়ের উৎসর্গ - পত্রে লেখা হয় '১৯৭১'। পাকিস্তান কিংবা সাম্প্রতিক বাংলাদেশের মাটিতে এই বই নিষিদ্ধ হবে এ আর বিচিত্র কী! কিন্তু ঘাতক শক্তি যখন বইনিষিদ্ধ করেও ক্ষান্ত হয় না, লেখকের প্রতি মৃত্যু পরোয়ানা জারি করে, তখন শান্তি আর সভ্যতা বাণী চরম মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়।
যে একাত্তরকে সারাজীবন তাঁর অন্তর্গত রক্তের গভীরে ধারণ করে ছিলেন, উপন্যাসের ক্লেদাক্ত অন্ধকার ভেদ করে শেষ পর্যন্ত লেখক সেই বাঞ্ছিত সত্যের শিখরে উপনীত হতে চেয়েছেন। অনৈতিক দেহ সম্ভোগের পৌনঃপুনিকতার মধ্যে যখন শাশ্বত প্রেমের জন্ম হয়, তখন এ ঋি সংসারে আর কিছুই অধিক গুত্বপূর্ণ মনে হয় না, তখন তথাকথিত জিহাদিদের গ্রুপ লিডার হাত থেকে পিস্তল ফেলে দিতে পারে, পানপাত্র চুরমার করে দিতে পারে, প্রেয়সীর হাত ধরে অন্ধকারের বুক চিরে আলোক াভিসারে যাত্রা করতে পারে। চোখের ঠুলি খসে পড়লে কেবলমাত্র রাতের ভোগ্য শরীরকেও জীবনের সহচরী ভাবতে বাঁধা থাকে না। উপন্যাসের শেষ বাক্যের মধ্যেই সেই সদর্থক উত্তরণের বার্তা ঘোষিত আছে, ''তখন ভোর হয়ে এসেছে, এক অরণ্যের পাশে সমুদ্রতীরে আমি গাড়ি থামাই, কনকলতাকে বুকে করে নামাই, সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে নিজেদের জড়িয়ে ধরে চুমো খেতে খেতে দেখি সমুদ্রের ভেতর থেকে সবুজের মাঝখানে একটি লাল টকটকে সূর্য উঠছে।''
সবুজ পতাকার মাঝখানে লালসূর্যই তো একাত্তরের মুক্তি সূর্য, বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা। হুমায়ুন সেই পতাকাকেই সেলাম জানিয়ে গেলেন। বাংলাদেশ তা গ্রহন করতে পারল না।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com